

বয়নহর্ম্যের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে কুমার অজিত দত্ত

এই মুহূর্তে আমার হাতের কাছে রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম অগ্রগামী গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্যের গল্পের বই ‘গল্প সংগ্রহটি’। স্বপ্না ভট্টাচার্যের গল্প আগে যে পড়িনি তা নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বা কোনো সংকলনে তাঁর গল্প পড়ার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। তবে, সংগ্রহের বা সমগ্রের একটা তাৎক্ষণিক মূল্য থাকে। গল্পকারকে নির্ণয় করা যায় স্বতন্ত্র একটি স্প্যানে। তাঁর প্রতিটি গল্পের চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে যে পারিপার্শ্বিক অবস্থান, দেশ-কাল, সময়ের বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত, সেগুলিকে তুলনামূলকভাবে অবলোকন করা যায়।

তাই, গেলো কয়েকদিনের প্রচেষ্টায় পাঠ করে ফেলেছি স্বপ্না ভট্টাচার্যের ‘গল্প সংগ্রহটি’ এবং তাঁর গল্পের প্রতিটি চরিত্র যেন আমার চারপাশে অবিরত ঘুরছে। কখনো মূর্ত, কখনো বিমূর্ত। ওরা যেন কাল-কালান্তরের চরিত্র। বড়ো কাছে, বড়ো আপন। এঁদের মধ্যে বেশ কয়েকটি চরিত্র অহরহ আমায় ভীষণভাবে অস্থির করে তোলে। নাকি ওদের পেছন পেছন অজান্তেই আমিই লেগে আছি, অনুসরণ করার মতো। ওদের চলাফেরা, ভাবনা, আবেগ, মন কেমন করা স্মৃতি, হাহাকার, বঞ্চনা, আর্তি, বর্তমানের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে না পারার তুমুল বেদনা, ভাটি-প্রীতি, বাস্তবচ্যুত হওয়ার যন্ত্রণা, মাটি কামড়ে পড়ে থাকার নিরীহ আচরণ, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, স্বপ্নভঙ্গ, উৎসে ফেরার আততি... আমাকে প্রতিনিয়ত উদাস আর অশ্রুমেদুর করে তুলেছে। ওরা কারা? ক্ষিতীন্দ্রমোহন, সুপর্ণা, অশোক, হেমাজিনী-বারিদবরণের অস্থি, ফুলমাসি, সোনা, মরণচন্দ্র দাস, লক্ষ্মীমাসি...। ওদের সঙ্গে আমিও জারিত হয়ে আছি যেন। পাঠক যখন কোনো গল্পের বয়ন-হর্ম্যের সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে কোনো চরিত্রের ভেতর অজান্তেই জারিত হয়ে যায় অর্থাৎ ওই চরিত্রের প্রতি সহমর্মিতা আর মায়া জেগে ওঠে তাঁর মনে, তখনই মেনে নিতে হয় গল্পকারের শ্রম সার্থক। সার্থক বিশিষ্ট গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্যের শ্রমও।

তবে মূল যে কথাটি, বয়ন-হর্য্য, কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যাকে আশ্রয় করে হয় চরিত্রের অভ্যুত্থান, সে-বিষয়টিও গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্য্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে সামাল দিয়েছেন। তাঁর সহজ বয়নপ্রসাদের গুণে চরিত্রগুলো হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। দেশ-কাল, অতীত-বর্তমান যেন ওই চরিত্রগুলোর ভাগ্যের লিখনের কাছে অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রথমেই আসছি তাঁর ‘উজান’ শীর্ষক গল্পে।

দেশ ছাড়ার যন্ত্রণা বাঙালির যায় না। ক্ষিতীন্দ্রমোহন সেই বাঙালি। দেশের মাটি, দেশের আকাশ-বাতাস নদী-নালা শুধুই স্মৃতিতে ঘুরে বেড়ায়। আর ঘুরে বেড়ায় তাঁর মৃত দুই সন্তানের স্মৃতি, যারা পৃথিবীর আলো দেখার আগেই ছেড়ে চলে গেছে তাকে আর চারুশীকে। দেশ বলে যে ওখানে সংসারের টানাটানি ছিল না বা অশান্তির উচাটন ছিল না, দুঃখ ছিল না, তা নয়। কিন্তু মাটির টান বড় টান। তার ওপর যে মাটিতে তার দুই সন্তানকে গোর দিয়েছেন নিজের হাতে, সে- মাটি যে তার বৃকের ভেতর থেকে সরে না। কিছুতেই ভোলা যায় না সে- মাটিকে। “ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া যে অনেক কিছু ছেড়ে যাওয়া— কিন্তু মুখফুটে চারুকেও বলতে পারতেন না। জমাট বাঁধা অশ্রু বৃকের ভেতর রয়ে গেলো চিরকাল। তবুও দেশ ছাড়তে হলো।” (পৃ: ৩৪)

হ্যাঁ, দেশান্তরিত হতেই হলো ক্ষিতীন্দ্রমোহনকে। তিনি হিন্দু বলে। তার তল্লাটের সব হিন্দুরা একে একে চলে গেছে। তিনিই একা মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। এরপর ভরসা দিতে পারছিল না ক্ষিতীন্দ্রমোহনকে কেউই। এমনকি পাশের বাড়ির মুসলমান বন্ধু মাজর খলিফাও নয়, যার সঙ্গে ক্ষিতীন্দ্রমোহনের আত্মীয়তার বন্ধন গড়ে উঠেছিল বহুদিন ধরে। গল্পকার স্বপ্না এই প্রসঙ্গে একটি ছোট্ট মধুর সহাবস্থানের টেক্সচার ছুঁয়ে দিয়েছেন, ‘পাশের বাড়ির মাজর খলিফা একদিন দাওয়ায় বসে পুজোর প্রসাদ খেতে খেতে বলছিল-

— “কর্তা ঠাকুর, কেনে পইড়া রইছইন। হক্কেলে গেলা, আপনের দাদাও গেলা— কর্তামার লাইগ্যা আমার ডর লাগে। মুখের দিকে চাইয়া বুজইন না? সময় থাকতে যাইন গিয়া দাদার কাছে— আমিও শান্তি পাই।” (পৃ: ৩৪)

এই যে ‘আমিও শান্তি পাই’ কথাটি খলিফার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো এটা তার মনের গভীর টান থেকে উঠে এসেছে। এখানে খলিফা হিন্দু না মুসলমান সেটা বড় কথা নয়। খলিফা এখানে একজন মানুষ। মানুষ তো মানুষের কাছে গিয়েই দাঁড়ায়। একজন প্রকৃত মানুষ তো চায় সবাই শান্তিতে থাকুক।

শেষমেষ, চলে আসতে হলো ক্ষিতীন্দ্রমোহনকে, ভাটির থেকে উজানে অর্থাৎ শিলচরে। দেশভাগের আগেও কাছাড়ে এসেছিলেন ক্ষিতীন্দ্রমোহন। সে- স্মৃতিও তাঁর রয়েছে। কিন্তু এখানে এসেও যেন তাঁর স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। নিরাপত্তার বাহুড়োর এখানেও নেই... সব যেন পাল্টে গেছে... পরিচিত মানুষ হারিয়ে গেছে। ...বার বার বন্যায় রাস্তা-ঘাটের দশা শেষ। ফলে মুড়ির টিনের মতো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে এনেছে বাস। কে কার গোয়ালে ধোঁয়া দেয়। আসামের কর্তারা কাছাড়কে তাদের কলোনি ভাবে। তাই উন্নতি নেই বরং দিন-দিন অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে।

বারো বছরে শিলচর অনেক পাল্টে গেছে, দোকান-পাট, ঘর-দরজা আগের মতো নেই। তা ছাড়া দৃষ্টি ক্ষীণ বলে চোখে ধূপছায়া। ইতঃস্তত করে একজন পথচারীকে জায়গাটার নাম জিজ্ঞেস করতেই বলল— কমলা ভট্টাচার্য রোড।

“ক্ষিতীন্দ্রমোহন থমকে দাঁড়ালেন। বুকের ভেতর সমুদ্রের জোয়ার... তাঁর জরাজীর্ণ শরীর শিহরিত হল। শহীদ কমলা। উনিশে মে, উনিশশো একষষ্টি। কোথায় গেল সেই শিলচর।” (পৃ: ৪২)

“ক্ষিতীন্দ্রমোহন দেশ ছেড়ে এসেছেন— এখানে এসে শুনেছেন ভাষাও ছাড়তে হবে। কোনো হিসেব মেলাতে পারেন না। এটা আসাম, আসাম কি হিন্দুস্তান নয়? ছেলেমেয়েরা নিজের ভাষায় পড়তে পারবে না কেন —এই উত্তর পান না। ক্ষোভে রাগে নিজেও মিছিলে হাঁটেন।” (পৃ: ৪৩)

দেশের প্রসঙ্গ এলে যারা খিঁচড়ে ওঠে তারা ভাটির দেশের মানুষ। ক্ষিতীন্দ্রমোহন ভাটির দেশের মানুষ। উমানাথের আবিষ্কার, “আপনে কোন দেশের মানুষ মহাশয়? ভাটির দেশের নি? কথায় কথায় রাগ দেখাইনা।” (পৃ: ৩৫) গল্পকার স্বপ্না ভাটির দেশের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিকটি, অন্য ভাবেও বলা যেতে পারে, ওদের মনের খরখরানির কারণটি সঠিকভাবেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশ ছেড়ে সর্বস্বান্ত হয়ে এপারে চলে এসেছেন যারা অথবা ভাটিতেই যারা হুমকির মুখে এখনো দিন যাপন করছেন তাঁদের মন যে চড়া থাকবে সেটাই স্বাভাবিক। “মনের মধ্যেই দেশ ছাড়ার ক্ষত থেকে তখনো কিছু কিছু রক্ত বেরোয়— আর তাই মেজাজ অল্পেতেই চড়ে।” (পৃ: ৩৫) ক্ষিতীন্দ্রমোহন যখন জবাব দেন, “দেশ লইয়া টানাটানি করবা না। দেশ ছাড়ছি। ভিখারি হইছি। ইতা মাত ছাড়ইনা।” (পৃ: ৩৫) উমানাথ জবাব দিয়েছে, “ভাটির দেশ-অ আমার বড় কুটুমরা আছইন, হেরাও খালি কথায় কথায় ফোঁস করে।” (পৃ: ৩৫)

সে যা হোক, কষ্টেস্টে মানিয়ে নিচ্ছিলেন ক্ষিতীন্দ্রমোহন আর চারুশশী। সুবিধা-অসুবিধা- বাধাবিঘ্ন আর যাই থাকুক প্রাণের ভয় এখানে নেই। কিন্তু দারিদ্র্য দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। চিকিৎসা করানোর ক্ষমতা ছিল না পর্যন্ত। বিনা চিকিৎসায় ক্ষিতীন্দ্রমোহনের চোখ দুটো নষ্ট হয়ে যাওয়ার মুখে। অন্ধ হয়ে গেলে তো অচল হয়ে যাওয়ারই সামিল। তাই চারুশশীর পরামর্শে এক কালের হঠাৎ সন্ধান খুঁজে পাওয়া প্রীতিলতা ওরফে তাঁর ফুলদির কাছে গিয়েছিলেন ক্ষিতীন্দ্রমোহন কিছু সাহায্যের হাত পাততে। ফুলদির বর উমানাথ আচার্যের সঙ্গে ক্ষিতীন্দ্রমোহনের পরিচয় হয়েছিল ইটভাঁটায়, যেটা ছিল ক্ষিতীন্দ্রমোহনেরই কর্মক্ষেত্র। তখন উমানাথের কাছেই জেনেছিলেন ফুলদির পরিবারের স্বচ্ছলতার কথা। চারুশশী লিখে দিয়েছিল একটি দু লাইনের চিঠি। চিঠিটি মর্মস্পর্শী: ‘দিদি, আপনাদের আদর যত্নের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলিতে পারি না। দিদি, চোখটা অপারেশন করাইতে পারিলে আরো কিছু দিন চলাফেরা করিতে পারিবে না।’ এই চিঠিটা ক্ষিতীন্দ্রমোহনের কাছে অত্যন্ত অনুভবের এবং পাঠকেরও। চিঠিটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে চারুশশীর ভাবাবেগ আর মানসযন্ত্রণা। এ ক্ষেত্রে পাঠক সমব্যথী হয়ে ওঠে চারুশশীর প্রতিও। স্বামীর জন্য নেপথ্যে থাকা চারুশশীর করুণ আর্তি যেন বুকে বাজে। এ গল্পে চারুশশী যেন নেপথ্য-চারুকলা।

চারুশশীর মুখের দিকে চেয়েই ক্ষিতীন্দ্রমোহন এসেছেন তাঁর অতি কাছের জন ফুলদিকে চারুশশীর লেখা চিঠিটা দিতে। চারুশশী বলেছিল, “দিদির ছেলেরা মানুষ অইছে— তারা বিমুখ করত না। আইজ বিপদ-অ পড়ছি দেইখ্যাই ত তারার কাছে যাইতা।” (পৃ: ৪৬)

হয়তো ফুলদি বিমুখ করতেন না। কিন্তু ক্ষিতীন্দ্রমোহনের ব্যক্তিত্বে বেঁধেছিল। তিনি চিঠিটা দিতে পারেননি। তাঁর ফুলদি, যে মায়ের স্নেহ দিচ্ছে আজও, তাঁর ভাগ্নে সমর, যে তাঁকে সেই ছোটবেলায় গল্পমামা বলে ডাকতো। তাঁর গল্প শুনে বড় হয়েছে। আজো ভোলেনি ওর গল্পমামাকে। আগের মতোই সমান আবেগিক। তাঁকে পেয়ে ওরা অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত, অত্যন্ত খুশি। কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না তাঁকে। তো, এই আনন্দঘন উচ্ছল মুহূর্তে কীভাবে ক্ষিতীন্দ্রমোহন তাঁর দারিদ্র্যকে উপস্থাপিত করবেন? “উনি না পারলেন চারুর চিঠিটি দিতে, না পারলেন নিজের আসার কারণটা বলতে। কচি-কাঁচাকে যতদিন পারেন উজাড় করে স্নেহ দিয়েছেন, আজ অঞ্জলি পেতে দাঁড়াতে পারছেন না।” (পৃ: ৪৬) গল্পকার স্বপ্নার অনন্য কলমচারিতার গুণে ক্ষিতীন্দ্রমোহনের এই মানসিক টানাপোড়েন বড়ো চমৎকারভাবে রূপ নিয়েছে।

এরপর চলুন ‘চম্পকনগর’। সুকৃতিরঞ্জন চৌধুরির গড়ে তোলা চম্পকনগর। এখানেও দেশান্তরিত হওয়ার কষ্টকথা। সুকৃতিরঞ্জন “ভাঁটির দেশের মানুষ। সামূহিক স্মৃতিতে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন মনসা-সংস্কৃতি। ফেলে আসা ভিটের দুঃস্বপ্ন মুহুর্তে স্বপ্ন দিয়ে গড়ে উঠেছিল চম্পকনগর।” (পৃ: ৩০৫)

চম্পকনগর ধীরে ধীরে স্মৃতি হয়ে ওঠে, গভীর স্মৃতি। ওই স্মৃতিই হয়ে উঠেছে ঐতিহ্য। ওই ঐতিহ্যে ফিরে যেতে চাইছেন ফুলমাসি। সঙ্গে নিয়েছেন ‘আমি’ হয়ে ওঠা অনুপমকে। ওই ‘আমি’ যেন আমি, মানে একজন পাঠকও, যে আখ্যানপ্রসাদে আপ্ত হয়ে আপন মনেই পিছু নিয়েছে ফুলমাসির।

ফুলমাসি বলেছেন, “...আমি ফিরতে চাই...অনু ...আমি দৌড়াচ্ছি... ফেরাতে চাই ...বল, বল তুই আমাদের সব খারাপ?” (পৃ: ৩১৩)

‘অমূল্য নিবাস’। এখানেও চম্পকনগর। প্রব্রাজনের কষ্টকথা। গল্পমামা দেশভাগের স্মৃতি ধরে রাখার জন্য সেখানে বাঁশবেতের ঘর বানিয়েছেন। তাঁর দাদু অমূল্য গোস্বামীর নামে এটার নাম রেখেছেন ‘অমূল্য নিবাস’। সে এক অতীত স্মৃতি। অনিবার্ণের বিনিদ্র রজনীতে বার বার মনে পড়ে যাচ্ছিল এক বিলুপ্ত নগরী, ধূসর প্রাসাদ, সে-প্রাসাদের মূল্যবান আসবাবপত্র আর লক্ষ্মীমাসির কথা। লক্ষ্মীমাসি, যে ১৯৮৩-র নেলি হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়ে, স্বামীকে হারিয়ে মেয়েকে নিয়ে এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছিলেন অশ্রিতা হয়ে চারুমামির কাছে, এই ‘অমূল্য নিবাসে’। তিনি ওই ঘটনার পর অনেকটাই অপকৃতিষ্ক। কিন্তু চারুমামির সংসারের কাজকর্ম করে দিতেন। এখনো ওখানেই আছেন তিনি।

অসীম, অনিবার্ণের ছোটো ভাই, যে বিদেশিনী বিয়ে করে বিদেশেই থাকে। এক কন্যা আছে। কিন্তু ভোলেনি ওর অতীত, ওর দেশ, ওর স্মৃতি, যেখানে রয়েছে ওর চম্পকনগর, ওর অমূল্য নিবাস। ছুটে এসেছে সে এই দেশের টানে। দাদা অনিবার্ণের সঙ্গে গিয়েছে সে অমূল্য নিবাসে। “পৌঁছেছিল তারা ঠিকই। গিয়ে অনুভব করেছে, না এলে ভালোই হত! ...যেন খণ্ডহর! অন্ধকার ঘরে একাকী লক্ষ্মীমাসি কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। শত চেষ্টাতেও চেনাতে পারেনি নিজেদেরে।” (পৃ: ৩৩৫)

ওরা এই পোড়ো বাড়িটায় গল্পমামার অস্তিত্ব অনুভব করেছে পরতে পরতে। চোখ ওদের ধূসর হয়ে আসে। ‘অমূল্য নিবাস’ ধুকছে। লক্ষ্মীমাসির খবর কেউ নেয় না। যখন ওরা ফিরে যাওয়ার সময় শেষবারের মতো বাড়িটির দিকে তাকায়, দেখে যেখানে ‘অমূল্য নিবাস’ লেখা ছিল সেখানে লেখা আছে Site for Petrol pump।

গল্পমামার দেশভাগের স্মৃতিকে রক্ষা করার আর কেউ নেই। ওই স্মৃতি ধূলার আস্তরণে ঢাকা!

‘বাস্তুহীন’ দুই বাস্তুহারার গল্প। কারা এই দুই বাস্তুহারা? বারিদবরণ আর হেমাঙ্গিনী। পূর্ববঙ্গের সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে উদ্বাস্ত হয়ে তাঁদের চলে আসতে হয়েছে এপারে। এখন আবার তাঁরা বাস্তুহারা হয়েছেন। অর্থাৎ বাস্তুহারা হয়েছে তাঁদের দুটি অস্থি।

মৃত্যুর পর বারিদবরণ আর হেমাঙ্গিনীর অস্থি পুঁতে রেখেছে তুলসীতলায়, তাঁদের দুই পুত্র, তাঁদেরই রেখে যাওয়া বাস্তুতে। ওই বাস্তু নিয়ে আবার দুই পুত্রের মধ্যে কলহ। যে-বাস্তু দেশভাগেরই স্মৃতি। ছোটো ছেলে সুদীপ্তকে বঞ্চিত হয়ে ওই পিতৃদত্ত বাস্তু ছেড়ে চলে যেতে হয় অন্যত্র এক অস্থায়ী আবাসস্থলে, একেবারে বরাক নদীর পারে। সুদীপ্ত পিতা-মাতার অস্থির গঙ্গাযাত্রার দায় নিয়ে সেই অস্থি তুলে নিয়ে আসে তার নতুন আবাসে। পুঁতে রাখে বাড়ির নদীর দিকের শেষ সীমানায় একটি আম গাছের নিচে। কিন্তু একদিন বরাক নদীর বিরাট ভাঙন গ্রাস করে ফেলে ওই আম গাছটি সহ বাড়ির শেষ সীমানাটি। খুঁজে পাওয়া যায় না আর অস্থি দুটি। আবার বাস্তুহারা হয়েছেন বারিদবরণ আর হেমাঙ্গিনী। দেশভাগের বলি হয়ে যারা চলে এসেছেন এপারে তাঁদের মসিরেখা বুঝি এমনই হয়। গল্পটি ভীষণ ছুঁয়ে যায়।

‘সমান্তরাল’ একটি ভিন্ন স্বাদের গল্প। আঙ্গিক স্ট্রিম অফ কানসাস। সুপর্ণা নাম্নী একজন নারী আত্মজৈবনিক দ্বন্দ্ব ক্ষত-বিক্ষত। স্বামীর সঙ্গে মতাদর্শে মিলছে না। ও যে পথে চলতে চায় স্বামী ঠিক তার বিপরীত। অথচ ভালোবেসেই বিয়ে করেছে সে পুরুষটিকে। তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। স্বামী-স্ত্রীর দুটি ভিন্ন মত সমান্তরালভাবেই দাম্পত্য জীবনে এগিয়ে চলেছে। তবে যন্ত্রণাটা সুপর্ণারই বেশি। সে নিজেকে ভাবছে গ্রিক ট্রাজেডির একজন নায়িকা। তবুও মানিয়ে নিতেই হয়। ‘কাঁদো নদী কাঁদো’। গল্পের ফাঁকে ফাঁকে বাংলা কথা-সাহিত্যের কয়েকটি মনকাড়া ছোটো ছোটো টেক্সচারের ছোঁয়া গল্পকারের মুন্সিয়ানার পরিচয়।

‘শবাগার’ শীর্ষক গল্পটি গল্পকার স্বপ্নার একটি হীরকজ্যোতি স্ট্রিম অফ কানসাসের সুপ্রয়াস। জাদুবাস্তবের কিছুটা ছোঁয়াও আছে। মরনচন্দ্র দাস নামে এক মৃতের পরিভাষিক যন্ত্রণাময় আত্মকথা গল্পটির আখ্যানভাগ আলোকিত করেছে। আখ্যানটি একটি বাস্তব ঘটনা-নির্ভর। তিন পুরুষের বাসিন্দা হয়েও মরণচন্দ্রের নাম এনআরসি-তে ওঠেনি, কপালে জুটেছে বিদেশি অপবাদ, তারপর স্থান হয়েছে তার কারাগারে। সেখানেই মৃত্যু। কিন্তু তার শবদেহ কাউকে সমঝে দিতে পারছে না

কর্তৃপক্ষ। কারণ তার পরিবারের লোকেরা সম্মত হচ্ছে না। তাদের যুক্তি, বন্দি মৃত যদি বিদেশি হয়ে থাকে তার শবদেহ তো বিদেশেই পাঠিয়ে দিতে হয়, ভারতে রাখা হবে কেনো? মরণচন্দ্রের শবদেহ শবাগারে পড়ে থেকে থেকে পঁচে যাচ্ছে ক্রমশ।

মরণচন্দ্রের শবদেহ কেউই স্বীকার করছে না। তবে মরণচন্দ্রের পরিচয়টা কী? “হিমঘরে মরণচন্দ্র মরছে ...মৃত্যুর পরেও তার মৃত্যু শেষ হচ্ছে না।” (পৃ: ৩২৩) এক্ষেত্রে গল্পকারের সুপার ইম্পোজ মার্কেজের ‘The handsomest drowned man in the world’ টি বেশ মানিয়ে গেছে। মরণচন্দ্রের শবদেহ ভাবছে, তবে কি তাকেও অজ্ঞাতকুলশীল ভেবে মান্দাসে ভাসিয়ে দেবে কেউ, সেখানেও পতাকায় লেখা থাকবে ‘কুকুর হইতে সাবধান’। এই বাক্যবন্ধটি গল্পকারের একটি চমৎকার টেক্সচার। এটিকে আতঙ্কের পরিভাষা হিসেবে সুন্দর ব্যবহার করেছেন গল্পকার। সাধু।

একজন নারী, সে যেন বাঁধা একজন পুরুষের কাছে। ওই পুরুষের কাছেই তাকে বার বার যেতে হয় ঘর বাঁধার জন্য, একটু ভালোবাসার জন্য। কিন্তু যখন তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্যই থাকে না ওই পুরুষটির কাছে, থাকতে হয় কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে থাকার মতো করে, তখন ওই নারীর খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না। হ্যাঁ, বেরিয়ে এসেছে ‘অবভাস’ গল্পের সোনা। “প্রাণপণে ভুলতে চায় সোনা সেই দুঃস্বপ্নের দিনলিপি।” (পৃ: ৩১৪)

কিন্তু সোনার কি নিস্তার আছে। সে যে নারী। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই যে নারীর, তার তো বিয়ে করা ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না। নয়তো বোঝা হয়ে থাকতে হয় তাকে পিতামাতার কাছে নয়তো ভাইদের কাছে। কিন্তু সোনা তো ডিভোর্সি। মনের মতো পাত্র কোথায়? কিন্তু বিয়ে তো দিতেই হবে। পাওয়া গেলো আগের পক্ষের এক ছোটো কন্যা সন্তান সহ দোজবর পাত্র ইন্দ্রনাথকে। থাকে বিদেশে, ইস্তামবুল। মা-বাবা চাপ দিতে থাকে। বাধ্য হয়ে সোনাকে মেনে নিতেই হয়। এবার চলে যেতে হবে তাকে একেবারে দূর বিদেশে। এক অচেনা পরিসরে। সোনার মন এক দিকে উদ্বেলিত হয় এক অজানা আশংকায়, অন্যদিকে মুষড়ে পড়ে মন কেমন করা স্মৃতিতে। “পেছনে পড়ে থাকবে তার স্বদেশ। তার প্রিয় বরাকভূমি। এম. এ. ক্লাসে স্যার বার বার আত্মসম্মান জাগাবার কথা বলতেন। কেন যেন আজকাল ঘুরেফিরে সে-কথাগুলো মনে পড়ে সোনার।” (পৃ: ৩১৯)

একজন নারী এমনই একজন পুরুষকেই চিরকালের জন্য কাছে পেতে চায়, যে তাকে দেখবে, তার প্রতি যত্নবান হবে, নিখাদ প্রেমে ভরিয়ে দেবে আর দেবে তারই রক্ত-মজ্জায় গড়ে ওঠা একটি ফুটফুটে সন্তান। কিন্তু ইন্দ্রনাথ যখন সোনাকে মোবাইলে

বললো, ‘মানে, ইয়ে... বলছিলাম কী, আমি কিন্তু আর দ্বিতীয় সন্তান চাই না’ তখনই সোনার বুঝতে অসুবিধে হলো না, ইন্দ্রনাথ যে তাকে অন্য কাজে ব্যবহার করার জন্য অর্থাৎ কেবল তার প্রথম পক্ষের কন্যাটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্যেই বিয়ে করতে চাইছে। “এক মুহূর্তে ইন্দ্রনাথের চেহারাটা নৃসিংহ অবতারে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সোনার মনে হতে থাকে ইন্দ্রনাথ দীর্ঘ নখ দিয়ে তার ঘিলু, হৃদয়, জরায়ু সব ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। সোনা হাঙরের সঙ্গে ঢেউয়ে লুটোপুটি খেতে থাকে। তার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে যায়।” (পৃ: ৩২১) সোনার আত্মসম্মান বোধে প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। তখনই সে হয়ে ওঠে দ্রোহী। ইন্দ্রনাথকে বিয়ে করবে না বলে সরাসরি দৃঢ় কণ্ঠে জানিয়ে দিতে পিছু পা হয়নি। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনচেতা সোনার সহমর্মী হয়ে ওঠে পাঠক। গল্পকার স্বপ্নার সরব লেখনীর মরমী প্রয়াসও সফল হয়।

এখানেই থামছি। আর এগোচ্ছি না। আমি সিদ্ধিতে বিন্দুই খুঁজলাম। বাকি খুঁজবেন অন্য পাঠকেরা।

গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্যের গল্পের পরিধি বিশাল। বয়ন থাকে ঠারেঠোরে। কোনো কোনো গল্প পড়তে পড়তে মনে হয় যেন উপন্যাসের দিকে যাচ্ছি। উপন্যাসের বীজ থাকে তাঁর সেইসব গল্পে। উপন্যাস লিখলেও উনি সফল হবেন আমার বিশ্বাস। সে প্রয়াস নিশ্চয় করবেন তিনি।

গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্যের লেখকসত্তার নেপথ্যে আরেকটি দিক আমাকে মুগ্ধ করেছে। সেটি তাঁর মানবিকসত্তা। একজন লেখককে ‘লেখক’ হয়ে ওঠার আগে হয়ে উঠতে হয় একজন উঁচু মনের মানুষ। সে-প্রমাণ রেখেছেন গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্য। তিনি ‘আমার কথায়’ স্বীকার করেছেন, ‘আমি যে-বর্গের বাসিন্দা, যাকে আমি চিনি তার কথাই লিখেছি। তার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করিনি।’ এই বয়ান একজন লেখকসত্তার বয়ান। কিন্তু এর বাইরে তাঁর ব্যক্তিসত্তা কী বলে দেখুন, ‘প্রতিদিনের ঘরের কাজে সাহায্য করে যারা আমার হাতে সময় তুলে দিয়েছে, সেই নেপথ্যবাসিনী অক্ষরজ্ঞানহীন রেণু, মালতি ও মণির কাছেও আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।’ কী কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি ও মানবিকতা! গল্পকার স্বপ্না ভট্টাচার্যকে টুপি খুলে কুর্নিশ।